সড়ক দুর্ঘটনারোধে আইনের প্রয়োগ ও জনসচেতনতা জরুরি

মোঃ আতিকুর রহমান মুফতি

অসহ্য যন্ত্রণা আর তীব্র হতাশা নিয়ে ব্যাংক কর্মকর্তা তাসনিম ফেরদৌস (ছদ্মনাম) খোলা জানালার দিকে তাকিয়ে আছেন। ২৭ দিন যাবত হাসপাতালের এই বিছানাটিতে একই ভঙ্গিতে শুয়ে আছেন তিনি। প্রথম দিনের অপারেশনে তার ডান পা শরীর থেকে কেটে বাদ দেয়া হয়েছে, আর দশদিন পরে হয়েছে মেরুদন্ডের অপারেশন। বেঁচে থাকলে বাকি জীবন হুইল চেয়ারে চলাফেরা ব্যতীত তার ভিন্ন উপায় নেই বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। এত কিছুর পরেও তিনি যে বেঁচে আছেন, সেটি পরম করুণাময়ের দয়া ছাড়া আর কিছু নয়। ফেরদৌসের স্ত্রী প্রথম দিকে হাসপাতালে এলেই কান্নায় ভেঙে পড়তেন, ছোট ছেলে দু'টোর দিকে তাকিয়ে এখন তিনি কিছুটা শক্ত হয়েছেন। তবে অনিশ্চিত আগামীর জন্য দুশ্চিন্তা প্রায়শই ঘিরে ধরে তাকে।

গত নভেম্বর মাসের ২৯ তারিখ সকালে অন্যসব দিনের মতো তাসনিম ফিরদৌস বাড্ডার ভাড়াবাসা থেকে মোটরসাইকেলে করে গুলশানে তার কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হন। গলির মুখে বের হতেই উল্টো পথে আসা একটি ডাম্পট্রাক তাকে চাপা দিয়ে চলে যায়। পথচারীরা দ্রুত রাজধানীর শের-ই-বাংলা নগরের জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) এ নিয়ে যায় তাকে। দুর্ঘটনার প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে ধাতস্থ হতেই তাসনিম বুঝতে পারেন তাঁর ডান পা-টি আর নেই। ডাক্তার জানান, কয়েকস্থানে ক্ষতিগ্রস্ত মেরুদন্ডটি নূন্যতম স্বাভাবিক অবস্থায় আনতে আরও দুটো অপারেশনের প্রয়োজন হবে, সেজন্য তাকে প্রায় চার মাসের বেশি সময় হাসপাতালে থাকতে হবে। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি তাসনিম তার ভবিষ্যতের কথা ভেবে কোনো উপায়ই খুঁজে পান না, শুধু চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে অশ্রুধারা।

কেবল তাসনিম ফেরদৌস-ই নন, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)-এর ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসের সড়ক দুর্ঘটনা বিষয়ক প্রতিবেদন অনুযায়ী, শুধু নভেম্বর মাসেই দেশের বিভিন্ন স্থানে ৪৪৯ টি সড়ক দুর্ঘটনায় মোট ৪৪৩ জন প্রাণ হারিয়েছেন, আর গুরুতর আহত হয়েছেন ৪১৩ জন। গত বছর অর্থাৎ ২০২৪ সালে সারা দেশে সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচ হাজার ৩৮০ জনের মৃত্যু হয়েছিল। এর মধ্যে শুধু মোটরসাইকেল দুর্ঘটনাতেই মৃত্যু হয়েছে এক হাজার ২০২ জনের, যা সড়ক দুর্ঘটনায় মোট মৃত্যুর ৩২ শতাংশের বেশি। আবার, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত দেশে সড়ক দুর্ঘটনায় তিন হাজার ৭৪১ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিআরটিএ-এর তথ্য অনুযায়ী, এই আট মাসে দেশে সড়ক দুর্ঘটনার মোট সংখ্যা তিন হাজার ৯৪৩টি এবং এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন মোট চার হাজার ৫৯৮ জন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনার প্রধান কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ফিটনেসবিহীন যানবাহন এবং অদক্ষ চালক। এমন বহু যানবাহন প্রতিদিন রাস্তায় চলছে, যেগুলো কোনোভাবেই নিরাপদ নয়। তদুপরি, অনেক চালকেরই যান চালানোর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নেই। একইভাবে, বেপরোয়া গতি এবং ট্রাফিক আইন না মানার প্রবণতাও সড়ক দুর্ঘটনার একটি বড়ো কারণ। চালকদের মধ্যে ট্রাফিক আইনের প্রতি অজ্ঞতা কিংবা ইচ্ছাকৃত অবজ্ঞার কারণে অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটে। মহাসড়কে যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের অভাবও এ ক্ষেত্রে বড়ো ভূমিকা রাখে। কিছু ক্ষেত্রে দেশের সড়ক অবকাঠামোর মানও সন্তুষ্ট হওয়ার মতো নয়। অধিকাংশ রাস্তাই নিয়মিত মেরামতের অভাবে বছরের কোন কোন সময় চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। তদুপরি, ক্ষেত্রবিশেষে ট্রাফিক সিগন্যাল, রোড সাইন ও পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা না থাকায় দুর্ঘটনার ঝুঁকি আরও বাড়ে। বিশেষত, শহরাঞ্চলে যানজট এবং গ্রামীণ অঞ্চলে সরু ও খারাপ রাস্তার কারণেও সড়ক দুর্ঘটনা সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সবার জন্য সড়ক নিরাপদ রাখতে উপযুক্ত আইন ও তার সঠিক প্রয়োগের বিকল্প নেই। সুশৃঙ্খল সড়ক ব্যবস্থাপনা জন্য এবং সড়ক দুর্ঘটনা রোধে দেশে কঠোর আইন রয়েছে। সড়ক পরিবহণ আইন-২০১৮ (যার কিছু ধারা পরে সংশোধন করা হয়)-এর ৬৬ ধারা অনুযায়ী ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যতীত মোটরযান ও গণপরিবহণ চালানো একটি অপরাধ, এবং এই অপরাধের জন্য দায়ী ব্যক্তির অনধিক ছয় মাসের কারাদন্ড, বা অনধিক পঁচিশ হাজার টাকা অর্থদন্ড, বা উভয়দন্ড হতে পারে। একই আইনের ৭৩ ধারা অনুসারে ভূয়া রেজিস্ট্রেশন নম্বর ব্যবহার ও প্রদর্শনে অপরাধে অনধিক দুই বৎসর তবে অন্যূন ছয় মাসের কারাদন্ড, বা অনধিক পাঁচ লাখ টাকা তবে অন্যূন এক লাখ টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ড আরোপ হতে পারে। আবার, ৭৫ ধারা মতে, মোটরযানের ফিটনেস সনদ ব্যতীত বা মেয়াদোত্তীর্ণ ফিটনেস সনদ ব্যবহার করে বা ইকোনমিক লাইফ অতিক্রান্ত বা ফিটনেসের অনুপযোগী-ঝুঁকিপূর্ণ মোটরযান চালনার কারণে অভিযুক্ত ব্যক্তি অনধিক ছয় মাসের কারাদন্ড, বা অনধিক ২৫ হাজার টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হতে পারেন।

এই আইনের ৮৫ ধারা অনুযায়ী, ট্রাফিক সাইন মেনে চলা সংক্রান্ত ধারা ৪২ এর বিধান লঙ্ঘনের দায়ে অনধিক এক মাসের কারাদন্ড, বা অনধিক ১০ হাজার টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ড আরোপের বিধান রয়েছে। ৮৬ ধারা মতে অতিরিক্ত ওজন বহন করে মোটরযান চালানো সংক্রান্ত বিধান লঙ্ঘনের কারণে অনধিক এক বৎসরের কারাদন্ড, বা অনধিক এক লাখ টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ড আরোপ হতে পারে। আবার ৮৭ ধারা অনুযায়ী, মোটরযানের গতিসীমা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিধান লঙ্ঘন করলে অনধিক তিনমাসের কারাদন্ড, বা অনধিক ১০ হাজার টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডের বিধান রয়েছে। আইনের ৯৮ ধারায় ওভারলোডিং বা নিয়ন্ত্রণহীনভাবে মোটরযান চালনার ফলে দুর্ঘটনায় জীবন ও সম্পত্তির

ক্ষতিসাধনের কারণে দায়ী ব্যক্তির অনধিক তিন বৎসর কারাদণ্ড, বা অনধিক তিন লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড হতে পারে। তবে, এটা মনে রাখতে হবে যে, দেশে সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে কেবল আইনের কঠোর প্রয়োগই একমাত্র সমাধান নয়।

আমাদের দেশে সাধারণত কোনো সড়ক দুর্ঘটনা ঘাটলে যানবাহনসহ অথবা যানবাহন ফেলে চালকের পালিয়ে যাওয়া একটি সাধারণ ঘটনা। তবে এটি গুরুতর অপরাধ। এটি শুধু আইনের লঙ্ঘনই নয়, বরং আহতদের সাহায্য না করে পালিয়ে যাওয়া নৈতিকতারও অবক্ষয়, যা চালকের বেপরোয়া মনোভাব, অদক্ষতা, এবং ট্রাফিক আইন সম্পর্কে অসচেতনতার কারণে ঘটে। সড়ক পরিবহণ আইনের ৬২ ধারা মতে, কোনো সড়ক দুর্ঘটনা ঘটলে সংশ্লিষ্ট মোটরযানের চালক, কন্ডাক্টর বা তাদের প্রতিনিধি তাৎক্ষণিকভাবে দুর্ঘটনা সম্পর্কে নিকটস্থ থানা, ফায়ার সার্ভিস, চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র বা হাসপাতালকে অবহিত করবে এবং আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির জীবনরক্ষার্থে দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিকটস্থ চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র বা হাসপাতালে প্রেরণ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। দুর্ঘটনার পরে অনুরূপ ব্যবস্থা না নিলে বা পালিয়ে গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তির অনধিক এক মাসের কারাদণ্ড, বা অনধিক বিশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ড হতে পারে।

সড়ক দুর্ঘটনা রোধে পথচারীদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। যার মধ্যে ট্র্যাফিক আইন মেনে চলা, জেব্রা ক্রসিং ও ফুটপাত ব্যবহার করা, ট্রাফিক সিগন্যাল অনুসরণ করা, রাস্তা পারাপারের সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার থেকে বিরত থাকা, প্রয়োজনে হাত তুলে চালকদের সংকেত দেওয়া ও অন্যমনস্ক না হওয়া উল্লেখযোগ্য। আবার, চলন্ত গাড়িতে সঠিকভাবে সিটবেল্ট ব্যবহার এবং যানবাহনে ওঠা বা নামার সময় সতর্কতা বজায় রাখাও গুরুত্বপূর্ণ। জনগণের মধ্যে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা অপরিহার্য। চালক, যাত্রী এবং পথচারীদের ট্রাফিক আইন মেনে চলার জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন ও এবিষয়ে ব্যাপক প্রচার চালানো যেতে পারে। গণমাধ্যম, সামাজিক সংগঠন এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে সড়ক দুর্ঘটনা রোধে দীর্ঘমেয়াদি এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণই এসমস্যা সমাধানে বেশি ফলপ্রসু হতে পারে। প্রথমত, অদক্ষ চালক এবং ফিটনেসবিহীন যানবাহন রোধে প্রশাসনিক উদ্যোগ নিতে হবে। ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে কঠোর নিয়মাবলি মেনে চলা এবং লাইসেন্স পাওয়ার আগে বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। ট্রাফিক আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করতে হবে এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করতে হবে। আবার, সড়ক অবকাঠামোর মান উন্নত করার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার বিকল্প নেই। রাস্তার মেরামত এবং সংস্কার নিয়মিত করতে হবে। পাশাপাশি, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ করা এবং ট্রাফিক সিগন্যাল, রোড সাইন, এবং পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা দরকার।

ইউরোপের উন্নত দেশগুলোয় সড়ক দুর্ঘটনারোধে গৃহীত বহুমুখী কৌশলগুলো আমারাও অনুসরণ করতে পারি। যার মধ্যে রয়েছে ‘ভিশন জিরো’-এর মতো নীতি। ‘ভিশন জিরো’ হলো একটি বৈশ্বিক কৌশল যার লক্ষ্য ট্র্যাফিক দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু ও গুরুতর আঘাত প্রতিরোধ এবং সকলের জন্য নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করা। এটি ১৯৯০ সালের দিকে সুইডেনে শুরু হয়েছিল এবং এর মূল ধারণা হলো সড়কে যানবাহন ও মানুষ চলাচলের সময় ভুল হতে পারে-এই বাস্তবতা মেনে নিয়ে সড়ক ব্যবস্থার নকশা করা, যাতে মানুষের ভুলের কারণেও যেন কেউ গুরুতর আহত বা নিহত না হয়। আবার, সড়ক দুর্ঘটনারোধে নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসেবে যানবাহনে এয়ারব্যাগ, অ্যান্টি-লক ব্রেকিং সিস্টেম ব্যবহার ও ইলেকট্রনিক স্টেবিলিটি কন্ট্রোল ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে। একই সাথে, অ্যালকোহল পান করে গাড়ি চালানো বন্ধে ‘সোবরিটি ডিটেক্টর’ ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা, ভিডিও ফুটেজ ও সেন্সরের মাধ্যমে সড়কে যানবাহনের গতি ও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বাংলাদেশেও চালু করা প্রয়োজন।

মনে রাখা দরকার যে, সড়ক দুর্ঘটনা আমাদের সামগ্রিক সামাজিক ব্যবস্থার একটি বড়ো ঘাটতি। এটি প্রতিরোধ করতে হলে প্রশাসন, জনগণ এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিটি পক্ষের মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন। যথাযথ পরিকল্পনা, আইনের কঠোর প্রয়োগ এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আমরা একটি নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারি। নিরাপদ সড়ক কেবল উন্নয়নের প্রতীক নয়, এটি একটি সভ্য ও মানবিক জাতির পরিচায়ক।

#

লেখক- সহকারী তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর।

পিআইডি ফিচার